প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ
ঢাকা, সোমবার, ৯ জুন ২০০৮, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, ৪ জমাদিউস সানি ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ২১২, আপডেট : বাংলাদেশ সময় রাত ০৩ মিনিট

খোলা হাওয়া

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

এবার সরকারের ভেতর একটু সংস্কার হোক

প্রায় ১৭ মাস আগে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর কয়েকটি দেশি-বিদেশি শব্দ চালু মুদ্রায় পরিণত হয়েছিল–তার একটি সংস্কার, আরেকটি রোডম্যাপ। শুরুতে অবশ্য কারও ধারণা ছিল না এ সরকার প্রায় দুই বছর ক্ষমতায় থাকবে, সে জন্য রোডম্যাপ শব্দটিও একটু পরের সংযোজন, যখন সরকার দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সংস্কার শব্দটি গোড়া থেকেই আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ডিসকোর্সের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সরকার চেষ্টা করেছে, মূলত রাজনৈতিক সংস্কার এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়কে তার মনোযোগের কেন্দ্রে আনতে। সরকারের এই প্রচেষ্টাকে দেশের মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে। তা ছাড়া সরকারের আরও কিছু সংস্কার কর্মসূচিও মানুষের সমর্থন পেয়েছে, যেমন–বিচার বিভাগের পৃথক সত্তা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সরকারি কর্মকমিশন শক্তিশালী করা। দুর্নীতি দমন কমিশন অনেক শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতাকে বিচারব্যবস্থার অধীনে এনেছে, যা রাজনৈতিক সংস্কারের পথ সুগম করবে বলে মানুষের মনে হয়েছে। পুনর্গঠিত সরকারি কর্মকমিশন যদি প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারি কর্মকর্তা হওয়া যাবে না–এ রকম একটা প্রত্যয়ও মানুষের মনে জেগেছে।

এ পর্যন্ত ঠিকই আছে এবং এসব সংস্কারের পেছনে সরকারের উদ্দেশ্য নিয়েও কেউ প্রশ্ন তোলেনি। তা ছাড়া সরকারের সংস্কার কর্মসূচির যে মূল কিছু লক্ষ্য রয়েছে, সেগুলো নিয়েও মানুষের মধ্যে দ্বিমত নেই। গত ১৫ মাসে এসব লক্ষ্য সম্পর্কে মানুষের একটা সম্যক ধারণাও হয়েছে–একই বিষয় প্রতিদিন পড়তে থাকলে শিক্ষার্থীদের যে রকম সে বিষয় সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি তৈরি হয়, অনেকটা সে রকম। আমরা জানি, রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা; দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দলগুলোর মধ্যে হানাহানি ও অবিশ্বাসের চর্চা সরিয়ে গণতান্ত্রিক আচরণ নিশ্চিত করা; রাজনীতিকে গণমুখী, দেশমুখী এবং উন্নয়নমুখী করা। এ জন্য প্রধান উপদেষ্টা একটি সম্ভাব্য সনদের রূপরেখাও তুলে ধরেছেন দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে। আমরা আরও জানি, দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিক ব্যবসায়ীদের জেলে পুরে সরকার ব্যবসায়ীদেরও সংস্কারের পথে আনার চেষ্টা করেছে, যেমন–ঘুষখোর আমলাদের বিচারের অধীনে এনে প্রশাসনের ভেতর একটি সংস্কার–প্রাতিষ্ঠানিক নয়, নৈতিক–আনার প্রয়াস নিয়েছে। এর বাইরেও শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংস্কারের একটা পরিবেশ তৈরিতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কার-উদ্যোগে সরকারের সফলতা প্রত্যাশা অনুযায়ী তো হয়ইনি, বরং দেখে-শুনে মনে হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা এখনো সেই বহুল উচ্চারিত ১/১১-এর আগের পর্যায়েই রয়ে গেছে। তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট–দলগুলোর ভেতর স্বার্থের প্রশ্নে ভাঙন ও দলাদলি; দুটি বড় দলের মধ্যে বিবাদ এবং একাত্তরের খুনি ও যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে আবারও বিএনপির ঐক্য। অথচ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টরের সেনাপতিদের ফোরামটি গত কয়েক মাস থেকেই বড় দলগুলোকে বলে আসছে, যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কে না যেতে এবং এ ব্যাপারে (যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে) ব্যাপক জনমতও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আগে যেমন, এখনো তেমন। বিএনপি আগামী নির্বাচনে জেতার জন্য জামায়াতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে যাচ্ছে। তাহলে সংস্কার কোথায় হলো? যদি মানসিকতারই কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে শুধু কিছু সংস্কারপন্থীর 'বৈপ্লবিক প্রস্তাব' দেওয়াই (যা নিজেদের নিরাপদ রাখার একটি কৌশল বলেই মনে হচ্ছে সবার কাছে) কি সংস্কার হয়ে যাওয়া? আওয়ামী লীগের চার সংস্কারপন্থী নেতা এ ক্ষেত্রে প্রথম বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। সংবাদমাধ্যমের কাছে এ চারজন চার দিনে চার দফায় সংস্কারের রূপরেখা তুলে

ধরেছিলেন। এখন এ চারজনই আবার মূলধারায় ফিরতে চাইছেন। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?

ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে যে 'নৈতিক সংস্কার' সরকার আশা করেছিল, তারই বা কী অবস্থা? ব্যবসায়ীদের অসাধু সিন্ডিকেটগুলো কি বিলীন হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে বাজারে জিনিসের মূল্য আকাশে তোলা যায় খুব সহজে এবং এই তোলার ক্ষেত্রে অসাধু কিছু ব্যবসায়ী যে ভূমিকা রাখেন, তাঁদের কি চিহ্নিত করা গেছে, শাস্তি দেওয়ার কথা না হয় তোলাই থাকুক? সরকারি প্রতিষ্ঠানে কি দুর্নীতি কমেছে? সার্বিকভাবে দেশের দুর্নীতি চিত্রের কি উন্নতি ঘটেছে? তাহলে?

২.

এর পরও ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের আশাবাদ কমেনি। শাসন পরিস্থিতি ২০০৭ নিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্সের করা এক জরিপে এই আশাবাদ আবারও প্রতিফলিত হয়েছে। '২০০৭ সালে বাংলাদেশের সুশাসন পরিস্থিতি: প্রত্যাশা, অঙ্গীকার ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশির ভাগ উত্তরদাতা সরকারের সংস্কার কর্মসূচিকে সমর্থন করেন। তাঁরা বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নিয়ে সন্তুষ্ট; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিচার ও মানবাধিকার এবং প্রভাবশালীদের বিচার নিয়েও তাঁদের মন্তব্য ইতিবাচক। তবে রাজনৈতিক সংস্কারের যে উদ্যোগ দলগুলো নিয়েছে, তা বাইরে থেকে চাপানো বলেই তাঁরা ভাবছেন। দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন পেশার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে তাঁরা শিক্ষকদের এখনো এগিয়ে রেখেছেন, অথচ ধর্মীয় নেতা, সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ ও রাজনীতিবিদেরা আছেন ক্রম অনুযায়ী নিচের দিকে। তবে প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতাই মনে করেন, ২০০৮ সালের মধ্যেই নির্বাচন হওয়া উচিত। ৩০ শতাংশ নারী উত্তরদাতা অবশ্য মনে করেন, ২০০৭ সালের মধ্যেই নির্বাচন হওয়া উচিত ছিল।

জরিপ থেকে দেখা যায়, সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা থাকলেও এর জবাবদিহি কমেছে বলে তাঁরা মনে করেন। সরকারি তথ্যপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত, মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার নেই। ফলে সরকারের সৃচ্ছতাও কম।
জরিপটি মাত্র তিন হাজার মানুষের মধ্যে পরিচালিত হলেও এর ফলাফলকে মূল্য দিতেই হবে। কারণ এই জরিপ সরকারের জন্য কিছু দিকনির্দেশনাও তুলে ধরেছে। এর দুটি বড় বক্তব্য হচ্ছে, সরকারের দায়বদ্ধতা অথবা জবাবদিহি বাড়ানো এবং এর কর্মকাণ্ডে সৃচ্ছতা আনা। এই বক্তব্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে শুরু থেকেই সরকার বলে আসছে, এটি ব্যতিক্রমী এবং এর কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা না থাকায় এটি প্রকৃত গণমুখী। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় যোগ করলে সরকারের কিছু করণীয়ও নির্দেশ করা যায় এবং বিষয়টি সরকার তার সংস্কার কার্যক্রম কেন হাতে নিয়েছে, এ প্রশ্নের উত্তরেই পরিষ্কার হয়। সরকার সংস্কার করছে, যাতে ভবিষ্যতের রাজনীতি উন্নত হয়; রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে এবং এক দলের সঙ্গে অন্য দলের আচরণে গণতন্ত্রের সূত্রগুলো প্রতিফলিত হয়; সরকার সৃচ্ছ এবং গণমুখী হয়; প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত হয়; পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মানুষের বন্ধু হয় এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয় তাদের আদর্শ; আদালতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু শিক্ষাই হয় মূল বিবেচনা, রাজনীতি নয় ইত্যাদি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি এই বহুবিধ সংস্কার সাধন করতে চায়, তাহলে তার নিজের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? অন্যকে কেউ আচরণ শেখাতে গেলে তার আচরণ কী হওয়া উচিত? অবশ্যই সংস্কৃত অথবা সংস্কারকৃত। অর্থাৎ যে চরিত্র ও আচরণ রাজনৈতিক দলসহ অন্যদের থেকে সরকার আশা করে–জনগণও আশা করে–তা এই সরকারের থাকাটা একটা বাধ্যবাধকতা–এর কমও নয়, বেশিও নয়।

এই সরকারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা তা নয়, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ওই জরিপে অংশ নেওয়া তিন হাজার মানুষ যেমন জানেন, দেশের বাকি মানুষও তা জানে। এই সরকার মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক সরকারের মতোই আচরণ করে, তথ্য গোপন করে অথবা ভুল তথ্য দেয়; অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে পুলিশি জুলুম করে, এমনকি রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করে মানুষকে (গত বছরের আগস্টে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে যে ন্যক্কারজনক আচরণ করা হয়েছিল, তা এই সরকারের ভাবমূর্তিকে যথেষ্ট ্লান করেছে); জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ঝুলিয়ে রাখে (বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সুরাহা করা, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার প্রকল্প); কথায় ও কাজে তার মিল থাকে না অনেক সময়। রাজনৈতিক সংস্কারের নামে শুরু থেকে যা হয়েছে, তাকে কী বলা যায়–সেই মাইনাস টু ফর্মুলা থেকে নিয়ে বর্তমানের সংলাপ পর্যন্ত? আর

দুটি বড় দল তাদের নেত্রীদের মুক্তির জন্য আন্দোলনের যে সামান্য হুমকি দিয়েছে, তাতেই শুরু হয়ে গেল গণগ্রেপ্তার। দেশের সব মানুষের কাছে এই গ্রেপ্তারের কারণটি পরিষ্কার হলেও সরকার বলছে, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য করা হচ্ছে। অথচ নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সেও এ রকম উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকার মিডিয়াকে চেপে ধরে আছে (একুশে টিভির টক শো সরকারের পছন্দ নয় বলে বন্ধ করে দিয়েছে) এবং এ নিয়ে সাংবাদিক-সম্পাদকেরা ক্রমাগত উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। প্রায় শত ভাগ জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা একটি সরকার যদি মিডিয়ার সঙ্গে এই আচরণ করে, তাহলে ৪০-৪৫ শতাংশ জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকারকে কোন নৈতিক ভিত্তি থেকে এই সরকার মিডিয়ার প্রতি সু-আচরণের সংস্কার প্রস্তাব দেবে? আদালত স্বাধীন হয়েছে বলছে সরকার, অথচ আইনজ্ঞ ও আইনজীবীরা বলছেন, সরকার আদালতের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। গরিব জনগণের জন্য সরকার খোলাবাজার ও বিডিআরের মাধ্যমে চাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল–অথচ তা এখন বন্ধ। বিডিআর বলছে, ৩০ টাকার নিচে মোটা চাল বিক্রি সম্ভব নয়। তাহলে গরিব মানুষ কোথায় যাবে?

৩.

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তার কথার সঙ্গে কাজের মিল রাখা এবং ভবিষ্যতের সরকারগুলোর জন্য রোল-মডেল হওয়ার জন্য কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার করতে হবে এবং তা এখনই। প্রথমেই জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে। এই সরকারের কোনো সংসদ নেই। মিডিয়াই সংসদ। মিডিয়াকে মুক্ত করতে হবে এবং প্রতিটি কাজের জন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের জ্বালানিনীতি নিয়ে প্রচুর অভিযোগ, উগ্রবাদী সংগঠন তোষণ (যাদের কাছে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি–নারী উন্নয়ন নীতি প্রায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে) এবং সংস্কারের নামে কিছু সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদ জড়ো করার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ রয়েছে। এদিকটা দেখতে হবে। অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা গতিশীল করতে হবে। দুই বছর একটি মেয়াদি সরকার বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অর্ধেক বাস্তবায়ন করতে পারে না, এ কেমন কথা? বিদেশি শ্রমবাজারে যে অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে, সে ব্যাপারেও সক্রিয়তা দেখাতে হবে।

অর্থাৎ সরকারের সব কর্মকাণ্ড স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গতিশীল করা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; অর্থনীতি, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন কাজে গতিসঞ্চার–এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি নিশ্চিত করা হবে সরকারের নিজের সংস্কারের বিষয়। মানবাধিকারের ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতির প্রয়োজন। দেশে কেন জরুরি অবস্থা চলছে, তা বোধগম্য নয়। জরুরি অবস্থায় নির্বাচন করা যাবে বলে দু-একটি ছোট ও মাঝারি দল মন্তব্য করলেও বড় সব রাজনৈতিক দল এবং জনগণ জরুরি অবস্থা চায় না। জরুরি অবস্থা তুলে সারা দেশে মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হবে সরকারের ভেতর সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ। যেহেতু তাতে মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের নানা বিধিনিষেধ উঠে যাবে, তাতে সরকারের জন্য গঠনমূলক সমালোচনা পাওয়া সহজ হবে। আগামী ছয় মাস এ সরকারকে অনেক কাজ করতে হবে, সে জন্য মানুষের আস্থা চাই পূর্ণমাত্রায়। মানুষও তা রাখতে প্রস্তুত, এখন সরকারের ভেতর কিছু সংস্কার হলে তা নিশ্চিত হয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com